

আ হ মে দ নূ র

কোটা নয়, মেধার হোক জয়

বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যাগুলোর অন্যতম বেকার সমস্যা। আর বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম কোটা সংরক্ষণ। কোটা প্রথার গ্যাড়াকলে পড়ে অনেক শিক্ষিত তরুণ বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং অনেক মেধাবী লোক উপযুক্ত পদে চাকরি না পেয়ে মানবের জীবনযাপন করে। অন্যদিকে কোটার ফাঁক দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদকে অলঙ্ঘিত না করে বরং কলুষিত করে।

কোটা প্রথার যৌক্তিকতা খুঁজতে হলে প্রথমে দেখতে হবে কেন এ প্রথা। আমাদের দেশে কোটা প্রথার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এক, দুর্বল বা অসহায় নাগরিকদের সুযোগ প্রদান, যেমন প্রতিবন্ধী কোটা; দুই, শিক্ষিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিতকরণ, যেমন মহিলা কোটা; তিন, বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মান প্রদান, যেমন মুক্তিযোদ্ধার পোষা কোটা ইত্যাদি। উদ্দেশ্যগুলো বিবেচনা করলে প্রচলিত কোটা সংরক্ষণ যৌক্তিক মনে হতে পারে। তবে যখন দেখা যায় কিছু নাগরিকের জন্য এসব কোটা সংরক্ষণ করতে গিয়ে অন্য নাগরিকদের প্রতি অবিচার করা হয় বা রাষ্ট্রে অন্য কোনো বড় সমস্যা দেখা দেয়, তখন কোটা প্রথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, প্রতীয়মান হয়। যেমন বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী কোটা রয়েছে ৬০ শতাংশ, আর ২০ শতাংশ রয়েছে পোষা, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি কোটা। এই ৮০ শতাংশ কোটা পূরণ করতে গিয়ে কোটার বাইরে মেধাবীদের জন্য অবশিষ্ট থাকে শুধুই ২০ শতাংশ পদ। তার মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ হয় মাত্র ২০ শতাংশ! দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান তাহলে কী করে উন্নত হবে? নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে গিয়ে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা এখন বড় শোচনীয়।

বিসিএসে মেধা তালিকা থেকে মাত্র ৪৫ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হয়। বাকি ৫৫ শতাংশ আসে কোটা থেকে। এছাড়া নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও একই কোটা সংরক্ষণ করা হয়। আর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মেধা তালিকা থেকে মাত্র ৩০ শতাংশ পূরণ করা হয়। মেধাবীদের আসন এভাবে সীমিত করে দেয়ায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী তার মেধাকে রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করতে পারে না। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আবার বিদেশ গিয়ে বিদেশের জন্য তার মেধা খরচ করে, আমরা যাকে বলি মেধা পাচার। এই মেধা পাচার যে আমাদের সিস্টেমটিক ত্রুটির কারণে হয়, তা নীতিনির্ধারকদের বুঝতে মনে হয় আরও কয়েক যুগ লেগে যাবে!

২০০৬ সালে আমি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রভাষক পদে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। এ

পদে সে বছর পুরো দেশ থেকে মাত্র ৮৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল, তবু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তখন ৩০ শতাংশ মহিলা কোটা পূরণ আবশ্যক হওয়ায় আমি ওই সনদ দিয়ে এখনও একটি চাকরি পাইনি। কী ছিল আমার অপরাধ? এদেশে আমার মতো কত হতভাগা এভাবে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট নিয়েও তৃতীয় শ্রেণীর জীবনযাপন করে, তাঁর হিসাব কে রাখে!

আমরা আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের কোনো যৌক্তিক দৃষ্টি না খুঁজে মনগড়া পন্থাই বেশি অবলম্বন করি। যার ফলে দেশে একটি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে নতুন অনেক সমস্যার জন্ম হয়। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য চাকরিতে তাদের জন্য ৬০ বা ৩০ শতাংশ আসন রাখার কি কোনো বিকল্প ছিল না? নারী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক ও উপবৃত্তিমূলক করেই একে উৎসাহিত করা যেত, নারীদের জন্য চাকরিতে পৃথক কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হতো না। এভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ করেই তাদের অসহায়তা দূর করা যেত, তাদের জন্য চাকরিতে কোটা রাখার প্রয়োজন হতো না। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের সন্তানদের জন্যও সম্মানজনক ও উপযুক্ত ভাতা বা প্রয়োজনে আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে তাদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হতো, তাদের জন্য পদে পদে কোটা রাখা আবশ্যক হতো না।

২১ অক্টোবর যুগান্তরের একটি প্রতিবেদনে কোটা প্রথা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন বলেছেন, 'মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য কোটা থাকলেও নাতি-পুত্রদের জন্য নয়। এমন সাহসী বক্তব্য বাংলাদেশে খুব কমই উচ্চারিত হয়। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত ও সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; কিন্তু চাকরিতে তাদের জন্য আলাদা কোটা না রেখে সবার জন্য চাকরিতে প্রবেশের সমান সুযোগ রাখা উচিত। আমার কথায় অর্থ এই নয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনি, নারী, প্রতিবন্ধী এদের চাকরিতে প্রবেশাধিকার দেয়া উচিত নয়। আমার কথা হচ্ছে, কোনো কোটা ছাড়াই দেশের সব নাগরিকের জন্য চাকরিতে প্রবেশের সমান সুযোগ রাখা উচিত। প্রতিযোগিতা করে— মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হোক বা কৃষকের সন্তান হোক, প্রতিবন্ধী কি নারী হোক— মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরাই যখন চাকরি পাবে, তখন কমে যাবে বৈষম্য, বেকার সমস্যা এবং মেধা পাচার। আশা করি, দেশ সে পথেই এগোবে। ভাল পথে আর নয়।

আহমেদ নূর : শিক্ষক
nurahmad786@gmail.com